সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নারী

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গীতারানী কর্মকার
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.9
Pages	167-178
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নারী

গীতারানী কর্মকার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন, তখন বাঙলা ছোটগল্পের নারী চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনুভূতিবহির্ভূত বিশ্বজনীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের সংযোগ ছিল অতি অল্প; বিশেষত, নারী-সম্পর্কিত যে পুরনো মূল্যবোধ,—স্বীকৃত হয়েছে তারই প্রতিষ্ঠা। প্রকারান্তরে নারীকে পুরুষের তুলনায় কিছুটা দুর্বল এবং মুখাপেক্ষিনী বলাই যেন ছিল তখন সঙ্গত। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়, তিনি অনেকটা সরে এসেছেন এ-ধারণা থেকে। তাঁর ছোটগল্পের নারীচরিত্রসমূহে প্রকাশ পায়, সমকালের বাঙালি সমাজের বৃত্তে নারীর একটি আলাদা নতুন পরিচয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখতে শুরু করেন ১৯২৮ সালে। এ সময়ের দেশীয় পরিস্থিতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষের জীবন নিরুদ্বিগ্ন ছিল বলা কঠিন। জাতীয় জীবনে তখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য জটিলতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। ঐ সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেশের পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। অধিকন্তু, বিশ্ব আর্থিক মন্দার প্রভাব মধ্যবিত্তের পারিবারিক স্বচ্ছলতা অনকটা সংকুচিত করে দিচ্ছিল বলে গৃহকোণের নারীসমাজও তার প্রতিক্রিয়া থেকে বিযুক্ত থাকতে পারেনি। কিছুটা বাধ্য হয়েই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বাইরের কর্মজীবনে প্রবেশের প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলে, তাদের ভেতর উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দ্রুত বিস্তৃত হয়। এর আগে উচ্চবিত্ত বাঙালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটলেও সধারণ পরিবারগুলোর মধ্যে তার বিস্তার ততটা ছিল না। এমন কি এক সময়ে—উনিশ শতকের মাঝামাঝি, রক্ষণশীল হিন্দু অভিজাত পরিবারের মেয়েদের জন্যেও স্কুলের গাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর বাধ্য হয়ে উৎকীর্ণ করেছিলেন শাস্ত্রবাক্য।[১] অবশ্য বিশ শতকে এসে এতখানি রক্ষণশীলতা অটুট ছিল না। বরং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেখা দেয় এ-ক্ষেত্রে চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের নারী চরিত্র প্রধানত এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। কিছু উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নারীর দেখাও মেলে এদের মধ্যে। তবে তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষের দিকের ছোটগল্পে প্রভূত সংখ্যায় নারীচরিত্র তিনি উপস্থাপিত করেছেন শ্রমজীবী দরিদ্র শ্রেণী থেকে। তাঁর ছোটগল্পের এই নারী চরিত্রসমূহের প্রেক্ষাপটে আছে লেখকের সমকাল ও বাঙলাদেশের সমাজ। বাঙলাদেশের সমাজের অভ্যস্ত চিন্তাধারায় নারী হচ্ছে একটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু; তাদের অন্তর-মাধুর্যে পারিবারিক জীবন হয়ে ওঠে ভালবাসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই শান্তি ও প্রসন্নতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবার জীবনের মধ্যেও জটিলতা একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। আবার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাও নারীকে স্বাভাবিকভাবেই স্পর্শ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রত্যক্ষ করা যায় সমস্যাসঙ্কুল পারিবারিক ও সামাজিক জটিলতার বিন্যাস-বৈচিত্র্য। ফলে, গল্পে তাঁর সৃষ্ট সাধারণ নারীর উপস্থিতিও হয়ে উঠেছে বিশেষ অর্থবহ।

ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট প্রথম নারী হচ্ছে 'অতসী মামী'। এই নারী-চরিত্রটির প্রেক্ষাপটে আছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের পরিবেশ। দরিদ্র ঘরের কন্যা হলেও আসলে সে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি। তার পরিচ্ছন্ন রুচি, মর্যাদাবোধ, সংযম ও সংস্কার প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিমিত জ্ঞানের পরিচায়ক। বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিষ্ণুতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা 'অতসী মামী' চরিত্রে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'অতসী মামী'র স্বামী ভক্তি, বিপদে ধৈর্য, অতিথি বাৎসল্য এবং সামাজিক সংস্কারে নিষ্ঠা প্রকাশ করে একটি কোমল ও মধুর স্বভাবের নারীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গল্পের শেষ পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটিতে উপস্থাপিত করছেন তেজস্বী ও সংসার নিরাসক্ত নারী হিসেবে।

'অতসী মামী' চরিত্রটির পরে 'নেকী' চরিত্রটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি শিক্ষিতা কুমারীর ছবি। গল্পটিকে নিটোল গঠনে বিন্যস্ত বলা না হলেও[২] 'নেকী' চরিত্রটিকে অনাড়ষ্ট তেজস্বিতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে 'অতসী মামী' ও 'নেকী' দুটি চরিত্রই দারিদ্র্যের পটভূমিকায় নির্মিত, কিন্তু দু'টি চরিত্রের মধ্যে ভাবাবেগপূর্ণ তেজস্বিতার অভাব নেই। এই দু'টি চরিত্রের স্বভাবগত তেজে অবশ্য ভিন্নতা আছে। 'অতসী

মামী'র তেজ সাংসারিক আসক্তি ত্যাগে উদ্দীপ্ত; কিন্তু 'নেকী'র তেজ যতটা অভিমান-প্রসূত ততটা দৃঢ়তার প্রকাশক নয়। 'অতসী মামী এবং 'নেকী' দু'টি চরিত্রই লেখক রচনা করেছেন রোমান্টিকতার দূরাভিসারী কল্পনায় রঞ্জিত অস্পষ্ট মায়ালোকের আবহে। যে রুচির সৌকুমার্য ও কল্পনার প্রখরতা এই রোমান্টিকতা সৃষ্টি করে, তা মধ্যবিত্ত চেতনায় খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

'অতসী মামী' ও 'নেকী'র পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন আরও বহু নারী চরিত্র। 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পে এসে সাক্ষাৎ মেলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যা 'মমতা'র। এক নতুনতর চেতনা তাকে সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়,—যা আগের দু'টি নারী চরিত্রে অনুপস্থিত। 'মমতা' দুর্ভাগ্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে; কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ-গল্পটি রচনার সময় ভারতের প্রায় সব প্রদেশে বিশেষ করে বাঙলা দেশের মহিলাদের পারিবারিক জীবন বর্জন করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার দাবি সমর্থিত হচ্ছিল।[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পটভূমিকাতেই উপস্থাপিত কছেন 'মমতা' চরিত্রটি। 'মমতা'র আদর্শবাদ, ত্যাগ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> কি একটা নারী সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাজে লেগেছে। চরকা ঘোরয়, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়, বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে স্বদেশী প্রচার করে।
>
> (বৃহত্তর ও মহত্তর)

তৎকালীন গান্ধীবাদী আন্দোলনের এই আবেগ সমর্থনের যুক্তি ছিল 'সিথিল, ভাবার্দ্র, চিন্তা সংগতিহীন।'[৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমতুল্য ভঙ্গিতেই উপস্থাপিত করেছেন এ-চেতনা। 'মমতা'র উক্তিতে মেলে তার সমর্থনঃ

> আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বহু উর্ধ্বে-আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র- আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেকট-প্রয়োজন অনেক মানে। বেশী কি, আমি আজ তোমার প্রণম্য।
>
> (বৃহত্তর ও মহত্তর)

ঐ সময়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য কোন গল্পে 'মমতার' বিদ্রোহী রূপটি অনুসৃত হয়নি। তখনকার সৃষ্ট আরও কিছু নারী চরিত্র, যেমন 'শিপ্রা', 'অনিন্দিতা', 'কেতকী' বা 'হিমানী' হচ্ছে উচ্চবিত্ত নাগরিক সমাজের প্রতিভূ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যজাত সংগ্রামস্পৃহা বড় একটা প্রকাশ করেননি। মূলত এই চরিত্রগুলো উচ্চবিত্ত পরিবার হতে আগত বলে এদের আর্থিক সমস্যা নেই। এদের সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে অতৃপ্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকে।

সমস্যাটি মনস্তত্ত্বমূলক হলেও তিনি এতে কোন রোমান্টিক আবহ সৃষ্টির প্রশ্রয় দেননি; বরং সমস্যার বাস্তবজীবন-সংলগ্ন দিকটিকেই প্রকট করে তুলেছেন। 'শিপ্রা' তার জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে আতঙ্কিত, আর 'অনিন্দিতা' কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে বর্তমান পরিস্থিতি। 'পরাশর'কে কেন্দ্র করে 'অনিন্দিতা'র প্রেম বা 'শিপ্রা'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে জীবন-কেন্দ্রিক বাস্তব সঙ্কটজাত। 'কেতকী'র জীবনে সঙ্কট এসেছে তার স্বামীর মনোবিকলনের প্রতিক্রিয়ায়; এ-সঙ্কট থেকে আত্মরক্ষা করা 'কেতকী'র পক্ষে অসাধ্য। 'হিমানী'র সমস্যাও জীবনের বাস্তবতা-সম্পৃক্ত।

এ চরিত্রগুলোর সৃষ্টিকালে বাঙলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান ছিল এক জটিল আবর্তের মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভাঙন অপসৃত না হতেই 'বিশ্ব-আর্থিক-মন্দা'র প্রভাবে বাঙালী সমাজ তখন অভাব-অনটনে বিব্রত। আবার দেশের রাজনৈতিক জটিলতাও স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে তুলছে। বাঙালী নারীর চেতনায় তখন বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বাসন্তী দেবী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মহিলার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। ফলে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল আত্মসচেতনতা। এই মহিলাদের কর্মকাণ্ডে ভাপ্রবণতার সংযোগ থাকলেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী বাস্তবতাসম্পন্ন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন ঐ সময়ের কথাশিল্পী। তাঁর ছোটগল্পে তিনি ভাবালুতার পরিবর্তে অবলম্বন করেছেন বাস্তবতা। সে জন্যেই তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র হয়েছে সাধারণত জীবনসচেতন। কম বেশি কিছু ভাবালুতা তাঁর প্রথম দু'টি গল্পেই আভাসিত হয়েছে। তবে এ দু'টি গল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রও বাস্তবতা-বর্জিত বলা যায় না। এ সময়ে সৃষ্ট তাঁর ছোটগল্পের একটি নারী চরিত্র হচ্ছে 'আগন্তুক' গল্পের 'শশীমুখী'। এ চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। তার স্বামী পাঁচ বছর প্রবাসের পরে প্রত্যাবর্তন করলে 'শশী মুখী অন্য দশটি নারীর মত উচ্ছ্বসিত হতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনভিত্তিক। 'শশী মুখী'র সঙ্গে তার স্বামী 'মুকুলে'র সম্পর্কের বর্ণনায় তাই আছে:

> বিবাহের পূর্বে শশী মুখীর সঙ্গে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যার বিছানায় তাই সত্যিকারের ফুল ছিল, এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের, বিছানায় তাই সুতার ফুল।
>
> দরজার বাহিরে ভিজা মুখখানা আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া শশীমুখী ঘরে ঢুকিল। প্রেম নয়, উত্তেজনা নয়, ভয়ে তাঁর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছে। স্বামী যখন আজও কাছে থাকিতে কালও কাছে থাকিত, তখনও তার মন যোগাইয়া চলা সহজ ছিল না, রোজই ভালবাসার পরিচয় দিতে হইত, ঘুমের জন্য মরিয়া গেলেও বলিতে হইত ঘুম পায় নাই, হাত অবশ হইয়া আসিলেও বলিতে হইত আর একটু বাতাস করি।

কিন্তু তখন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল, মুকুল ভাল করিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল কি ভাবে তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, মুকুলের হৃদয়কে নকল করিয়া চলিলেই তখন বেশ দিন কাটিত। আজিকার অসাধারণ অবস্থায় কি করা দরকার কিছুই শশীমুখী ভাবিয়া পাইতেছে না।

মাষ্টারের কাছে পড়া দেওয়ার মত করিয়া সে তাই বলিল, ভাল ছিলে?

(আগন্তুক)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ,—কিন্তু 'শশীমুখী'র মনের অতি-বাস্তব দিকটি এখানে মোটা রেখায় আঁকা হয়েছে। স্বামী 'মুকুলে'র প্রভুত্ব-চিন্তা স্ত্রী 'শশীমুখী'র বোধের বাইরে ছিল না। 'শশীমুখী' সমাজের এ-রীতিকে মেনে নিয়েছিল সহজভাবে। তার কাছে এই-ই ছিল 'ধরাবাঁধা নিয়ম।' কিন্তু পাঁচ বছর পরে বিদেশ প্রত্যাগত মুকুল স্ত্রীর কাছে যে সরলতা প্রত্যাশা করছিল, তা যে অটুট ছিল না, সেটা তার অজানা রইল না। বরং সে বুঝতে পারল, 'শশীমুখী'র মনে সরলতার স্থান অধিকার করেছে বাস্তবনিরীক্ষার প্রবণতা। গল্পকারের বর্ণনায় 'শশী মুখী'ও 'মুকুলে'র ভাবান্তর প্রকাশে আছে:

.......পাঁচ বছর আগে শশীমুখীর এই বার বার উঁকি দেওয়া আর মুখ লাল করার মধ্যে ভালবাসার প্রকাণ্ড একটা প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ তার অভিজ্ঞতায় ইহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।' (আগন্তুক)

প্রখর বাস্তবতাবোধের ফলেই 'শশীমুখী'র মনে 'মুকুলে'র জন্যে উচ্ছ্বাসের কোন প্রাবল্য নেই; বরং তার পরিবর্তে প্রকাশ পেয়েছে পর্যবেক্ষণের প্রয়াস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এই-ই প্রথম উপস্থাপিত হয়েছে এ ধরনের হিসেবী নারী চরিত্র।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের 'পাঁচী' এই প্রকৃতির একটি হিসেবী নারীচরিত্র। 'পাচীর' জীবনে প্রেমের সুকুমার অনুভূতি অজ্ঞাত। এ গল্প রচনার অনতিকাল পূর্বে 'কল্লোল' পর্যায়ের লেখকদের কথাসাহিত্যে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র অনেকটা রোমান্টিকতা আরোপ করে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবেই সরে এসেছেন সে পথ থেকে।[৫] সাধারণত 'কল্লোল' পর্যায়ের লেখকদের গল্পে জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তেও প্রেমকে উপস্থাপিত করা হয়েছে মানব-মানবীর আত্মিক মিলনের সেতু হিসেবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে দেহের ভূমিকা তাঁরা অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে, 'প্রাগৈতিহাসিক' 'পাঁচী'র সঙ্গে 'বসির' বা 'ভিখু' দু'জনেরই সম্পর্ক একান্ত জৈবিক। দেহাতিরিক্ত কোন ভাবনা তাদের মধ্যে অকল্পনীয়। এরা একজন আরেকজনকে অবলম্বন করে শুধু

নৈমিত্তিক প্রয়োজনই মেটায়। আসলে শ্রেণীগত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ফলেই নির্মিত হয়েছে 'পাঁচী'র এই মানসিকতা। 'পাঁচী'র উক্তিতেই মেলে এ তথ্যের প্রমাণ; যেমন:

> ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম। (প্রাগৈতিহাসিক)

এ-পর্যায়ের আর একটি নারী হচ্ছে 'উদারচরিতানামের বৌ' গল্পের 'শতদলবাসিনী'। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু ও পরিচারিকার। প্রেমহীন সংসারকে সে বন্দীশালার মত অনুভব করে। তার চেতনায় ভালবাসা হচ্ছে পরস্পর-সাপেক্ষ বিষয়; স্বামীর নিরাসক্তি তার মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে স্বল্প-পরিসরে নারীর জননী-রূপটি আকর্ষণীয়। নারীর মধুর মাতৃ-রূপ চিত্রণে প্রথমেই প্রত্যক্ষ করা যায় 'যাত্রা' গল্পে 'ইন্দুর মা' চরিত্রটি। গল্পের প্রধান চরিত্র নয় 'ইন্দুর মা'; কিন্তু চরিত্রটিকে বলা যায় জীবন্ত। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীর গুরুদায়িত্ব, অভাবের তাড়না কোন কিছুই যে মাতৃস্নেহকে বাধা দিতে পারে না, তা গল্পটিতে সহজে চোখে পড়ে। 'ইন্দুর মা' কোন মহৎ আদর্শের অনুসারিণী নয়; তার পরিবারের বাইরে বিশাল পৃথিবীর খবর সে রাখে না। সংসার এবং সন্তানই এই মায়ের জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে সদ্যবিবাহিতা কন্যার মুখে দুধের বাটি তুলে ধরা এবং বিবাহের পূর্বে কন্যার প্রতি কঠোর ব্যবহার স্মরণ করার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে স্নেহব্যাকুল একটি মায়ের ছবি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে জননীর প্রতিবাদী রূপটিকে অনেকাংশে বাস্তব আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত হয় না। সাধারণত, তাঁর ছোটগল্পধৃত নারীদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবার হতে আগত। প্রতিবাদী প্রকৃতিটি যেন এদের মজ্জাগত। সন্তানের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে তারা অন্যায়ের সঙ্গে আপস মেনে নেয় না। এ-প্রসঙ্গে 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে 'ময়নার মা' চরিত্রটি সর্বাধিক উজ্জ্বল। কোন রকম ভাবালুতা প্রকাশের অবকাশ এ- চরিত্রটিতে নেই। দরিদ্র কৃষকরমণীর মাতৃত্ব দৃপ্ত হয়ে উঠেছে তার তেজস্বিতার স্পর্শে। সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ—দুই মিলে তার অন্তরে সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ড শক্তি। সমগোত্রীয় আর একটি নিদর্শন 'মাসি-পিসি' গল্পটি। এ গল্পের 'মাসি-পিসি'র অনুভূতি 'আহ্লাদী' সম্পর্কে হয়েছে মাতৃতুল্য। তারাও সমাজপতিদের চোখরাঙানি বা

শাসকশ্রেণীর কূটবুদ্ধিকে ভয় পায় না। তাদের হৃদয়ের কোমলতম স্থানটি পূর্ণ করে আছে 'আহ্লাদী'র প্রতি স্নেহ।

'আজ কাল পরশুর গল্প'-এর 'মুক্তা' বা 'নমুনা' গল্পের 'শৈলর মা' চরিত্রে তেজস্বিতার প্রকাশ না ঘটলেও মাতৃত্ব তাদের কাছে অবহেলার বিষয় নয়। তারা পরিস্থিতির অসহায় শিকার; তাদেরও সন্তান স্নেহ একান্ত বাস্তব। সন্তানের করুণ মৃত্যুতে অসহায় ক্ষোভে 'মুক্তা' বলে:

> দাস মশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল। (আজ কাল পরশুর গল্প)

তের শ' পঞ্চাশের মন্বন্তরে কন্যা 'শৈল'কে নারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রাক্কালে:

> ...শৈলর মা বিনায়, কাদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়ঃ তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর! (নমুনা)

'শৈলর মা' 'বিনায়' কিন্তু বাধা দেয় না। এ দুর্বলতার সবটাই নিজের স্বার্থের জন্যে নয়, উপবাসী সন্তানের আহার্যের নিশ্চয়তাও তার মধ্যে আছে।

'মমতা' (বৃহত্তর ও মহত্তর) চরিত্রটিতে আছে জননীত্বের বিদ্রোহী ধারণা। এই জননী বিদ্রোহী হয়েছে স্বামীর বিবেকবর্জিত কর্মকাণ্ডে, বিরাগ প্রকাশ করেছে সন্তানের অধঃপতনে; আসলে সন্তান তার বিরাগের বিষয় নয়। মাতৃত্বের অপমান তাকে পরিবারের বাইরে নিয়ে এলেও, স্বামী ও সন্তানের কল্যাণ কামনা সে রোধ করতে পারে না। 'মমতার এই অন্তর্দ্বন্দ্বই তার জননীত্বকে করেছে অন্যতর। এমনি একটি জননী চরিত্র হচ্ছে 'পূজারীর বৌ' গল্পে 'কাদম্বিনী'। 'কাদম্বিনী'র জননীসত্তা স্থান পেয়েছে তার ধর্মবোধেরও ওপরে।

বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর 'জননী'-রূপের মধ্যে কোন আদর্শ ধারণা প্রকাশ করার চিন্তা করেননি। সুখে-দুঃখে, ভাল-মন্দ মিলিয়ে সন্তান যে একটি নারীর সত্তায় মিশে থাকে, এ অনুভব প্রকাশের প্রয়াসই তাঁর ছিল। এক জন নারী স্বামীকে তার সন্তানের দায়াধিকারী বলেই জানে। স্বামীকে 'দেবতা' মনে করা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে 'অতসী মামী' ছাড়া আর কোন নারীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি; তবে 'অতসী মামী' নিঃসন্তান।

সমাজচ্যুতা নারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে অধিকার করে আছে একটি বিশেষ পর্যায়। তাঁর বেশ কিছু গল্পে অঙ্কিত হয়েছে সমাজচ্যুতা নারী চরিত্র। 'কল্লোল' অধ্যায়ের লেখকগণ সমাজচ্যুতা নারীকে উপস্থাপন করেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে। প্রসঙ্গত, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগর-সঙ্গমে', 'সংসার-সীমান্তে', 'মহানগর' বা 'ইতি' প্রভৃতি গল্পের উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি যে আংশিক, তার প্রমাণ উপস্থিত হয় অনতিকাল পরেই। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অনুক্রমেই আগমন ঘটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁদের শিল্পকর্মে পতিতা নারীর সুখ-দুঃখকে তাঁরা চিত্রিত করেছেন সমাজের আর দশটি সাধারণ মানুষের মত। 'অভিনেত্রী', 'হিংয়ের কচুরী', 'হাবো' প্রভৃতি গল্পে আছে এই দৃষ্টিরই নিদর্শন। কিন্তু এঁদের গল্পের পতিতা চরিত্রগুলোও প্রধানত সাধারণ ভাবাবেগে পরিচালিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে 'রাজলক্ষ্মী' বা 'চন্দ্রমুখী'র আদলে কোন নারীর দেখা মেলে না। তিনি মানুষকে দেখেছেন বাস্তব জীবনের পটভূমিকায়-- কোন অবাস্তব প্রেমের প্রতিমূর্তি হিসেবে নয়।[৬] তাঁর উপলব্ধিতে,-- শরৎ সাহিত্যের সমাজচ্যুতা নারীর প্রেম হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 'ছাঁকা অবাস্তব প্রেম।' এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন রাখেন:

> বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন? ঘরের দেওয়াল খসে পড়লে, আর সতর্ক পাহারা সরে গেলেও নারী অমানুষ হয়ে যায় না, এই সত্যের সঙ্গে কি বিরোধ আছে বাস্তবের?[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উক্তির যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর ছোটগল্পের সমাজ পরিত্যক্তা নারী চরিত্রে। এ ধরনের নারীকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন বাস্তব অবস্থানে। তিনি অনুভব করেছেন এদের জীবনে ভাবালুতার পরিবর্তে জীবিকার প্রয়োজনই অধিক ক্রিয়াশীল। আবেগের পরিবর্তে অর্থই হয়েছে তাদের হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক। তাঁর গল্প 'তারপর?'-এ 'ফুল' এই শ্রেণীর নারী। তার রূপের বর্ণনাটিও বিশেষ অর্থবহ:

> ....ফুল দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয় কিন্তু তার চেহারায় একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে ঘরোয়া ভাবের। মা শিশুকে আদর করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে তখন তার যে রকম মুখের ভঙ্গি হয়, তারই স্থায়ী ছাঁচে ঢেলে যেন মুখখানা গড়া হয়েছে ফুলের। তার কথা মিষ্টি, হাসি মোলায়েম। তবু তাকে যারা চেনে তারা তাকে ভয় করে। এই শান্ত নম্র গেরস্ত বৌটির মত চেহারার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে তার ধারে অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। (তারপর?)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র যে তাদের নিজস্ব বাস্তব অবস্থানে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা এই বর্ণনাটিতে অনুধাবনযোগ্য। এই নারীটি জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা সাধারণ দৃষ্টি নয়; তার জীবনধারণের সঙ্কট তাকে মানুষের মহৎগুণাবলীর অনুশীলন করার সুযোগ দেয় না। কোমলতার কোন অবশিষ্টাংশ যদি এই নারীটির অন্তরে থেকেও থাকে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রকাশকে মনে হয় অনেকটা অবাস্তব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের পতিতা নারী প্রধানত আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি। এদের চরিত্রে কোন মহত্ত্ব আরোপিত করার পরিবর্তে লেখক উপস্থাপন করেছেন তাদের অবস্থানগত স্বাভাবিকত্ব। তাঁর এ-পর্যায়ের গল্পের চরিত্র আলোচনায় ধরা পড়ে এ সত্যটি। 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পের 'সরলা' একটি পতিতা; কিন্তু তার কর্তব্যবোধ তাকে ধরে রেখেছে সাধারণ নারীর স্তরে। স্বার্থবুদ্ধিতে 'সরলা'র মানবিক হৃদয়ানুভূতি নষ্ট হয়নি। তবে জীবনের অনিশ্চয়তার আশঙ্কা 'সরলা'কে পীড়িত করে। 'আজ কাল পরশুর গল্পে' 'মুক্তা' দুর্ভিক্ষের তাড়নায় গৃহত্যাগ করলেও আবার ফিরে এসেছে স্বামীর কাছে। এই ফিরে আসাতে সাহায্য করে তারই মত সমাজচ্যুতা 'গিরি'। আর্থিক পরিস্থিতিই তাদের জীবনে বিপর্যয়ের মূল। 'নমুনা' গল্পের 'শৈল' বিক্রিত হয় পরিবারের আহার্যের মূল্য হিসেবে। জীবনের এই পরিণতি সে বাস্তব বলে মেনে নেয়। 'অমানুষিক' গল্পের 'কুঞ্জা'ও এ ভাবেই স্বীকার করে নেয় বাস্তব জীবন। এ দু'টি চরিত্রের পরিণতির প্রেক্ষাপটে আছে বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম। এদের অভিরুচির কোন মূল্য এখানে নেই।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পের 'সুশীলা' চরিত্রটি পতিতা হিসেবে চিত্রিত হয়নি; তবে তার জীবনের পরিণতি আরও জটিল। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় স্বামীর স্বার্থের প্রয়োজনে; তার নিজের ইচ্ছার কোন অবকাশ এখানে নেই। এই নারীচরিত্রসমূহ রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্ত করেছেন আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের ভয়াবহ রূপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে অঙ্কিত প্রেমের চিত্রে নারী চরিত্রসমূহ প্রধানত অনুচ্ছ্বাসিত এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। বলিষ্ঠ প্রেমের চিত্রে 'নেকী' গল্পের 'লীলা' ও 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পের 'অনিন্দিতা' আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের অধিকার। 'শিলা' (শৈলজ শিলা) বা 'কাদম্বিনী' (খুকী) তাদের প্রেমের মর্যাদা এত টুকু ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি। দরিদ্র পরিবারের কন্যা 'মালতী' (প্যাঁক) অর্জন করে নেয় শিক্ষিত তরুণ 'সুশান্তর' প্রেম। এ সব আত্মসচেতন নারী চরিত্রের পাশে 'সর্পিল' গল্পের 'কেতকী' একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। 'কেতকী'

পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং 'শঙ্করের' সঙ্গে যাপন করে প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন; 'অনন্তে'র প্রেমকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার মত মানসিক শক্তি অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয় না; বরং নিরুপায়ভাবে মৃত্যু বরণ করে। এখানে লক্ষণীয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রগুলোকে পরিবেশচ্যুত করেননি। প্রতিটি নারী চরিত্রই স্ব স্ব অবস্থানে স্বাভাবিক হয়েছে এবং আতিশয্যের বিড়ম্বনায়ও ভারাক্রান্ত হয়নি।

প্রেমের চিত্রে আরও কিছু নারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আকর্ষণীয়। এর ভেতর 'মহাজন' গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র 'বাঞ্ছা' একটি। গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে তার যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 'বন্যা' গল্পের 'আলতামণি' স্বামীকে ভালবাসে গভীরভাবে। তার সে ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে অবোধ শিশুর মত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্বামীর প্রতি স্নেহ ও কর্তব্যপরায়ণতায় মিশ্রিত। 'সামঞ্জস্য' বা 'ভালবাসা' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুটি নারী চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তিনি প্রয়াস পেয়েছন তাদের নিয়ে একটু ভিন্নধর্মী পরিবেশ রচনার। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের পরে তিনি চিত্রিত করেন এ দু'টি নারী চরিত্র। তিনি তখন স্ব-মতবাদের আলোকে ব্যক্তির জীবন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী। ফলে, এই দু'টি চরিত্র সংবলিত গল্প দু'টির আবহ্ রচিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। 'সামঞ্জস্য' গল্পের 'গীতা' ভালবাসার প্রতিযোগিতায় তার স্বামী 'প্রমথ'কে পরাজিত করতে গিয়ে জেল খাটে। 'ভালবাসা' গল্পের 'মালতী শান্তি-মিছিলে যোগ দিয়ে দাঙ্গায় নিহত্ স্বামীর শোক ভোলে। গল্প দু'টির আদর্শগত দিকটি অনুক্ত রেখে বলা যায়, গল্পধৃত এই দু'টি নারী চরিত্র আসলে ভালবাসার প্রতিই অনুরক্ত।

'বৌ' গল্পমালায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ব্যতিক্রমী। প্রতিটি গল্পের নায়িকাদের বিশিষ্ট পরিচয় বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন পরিবারের বধূ হিসেবে। এরা মূলত সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নারীপ্রতিনিধি। এদের মনের যে বিচিত্র গতি-প্রকৃতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে। তাঁর এ গল্পগুলোতে আঁকা হয়েছে তেরটি বধূর ছবি। সমাজের তেরটি প্রকরণের নারীর প্রতীক হিসেবেই এই চরিত্রসমূহের বিশেষত্ব। এই তেরটি বধূর মধ্যে বারজনই তাদের স্বামীর পরিচয়ে চিহ্নিতা। একমাত্র 'তেজী বৌ'-ই পরিচিতি পেয়েছে নিজের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি, যা পেরেছে অন্যরা। তার তেজস্বিতার অবলুপ্তি

প্রসঙ্গে হয়তো পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পরিণতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।[৮] বস্তুত, আত্মোপলব্ধির চেতনাই এদের চরিত্রে আরোপ করেছে বিশেষত্ব। এরা সমাজে কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারিনী নয়; তবে পরিবারিক সীমাবদ্ধতাকেও নিঃশব্দে মেনে নেয়নি এরা। গল্পগুলোর রচনাকাল-সম্পৃক্ত বাঙলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিও অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। এই গল্পসমূহের নারী চরিত্রগুলো সমকালের দেশীয় অর্থনীতি-বহির্ভূত নয়।[৯]

গল্প রচনার সূচনাকাল থেকে নারীকে আত্মমর্যাদা-সচেতন করে প্রকাশ করার প্রয়াস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল অব্যাহত। সাহিত্য-জীবনের প্রাথমিক কালে তাঁকে ফ্রয়েডের মতাদর্শে প্রভাবিত বলা হয়। তবে তাঁর রচিত নারী চরিত্র সম্পর্কিত ঐ ধারণাটিও অস্পষ্ট ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবে তিনি মানুষের সমষ্টিবদ্ধ রূপটির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তখন সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান তাঁর দৃষ্টিতে আলাদা প্রতিভাত হয়নি। এ সময় থেকে অনুভব করা যায়, নারী তাঁর গল্পে পুরুষের সহচারিনী শুধু নয়,—সমমর্যাদার কর্মসঙ্গিনীও।

আত্মবোধসম্পন্ন নারীপ্রকৃতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেছেন সাহসী চেতনার উপস্থিতি। এই চেতনাই নারীকে জীবনে ও কর্মে প্রেরণা যোগায়। তাঁর ছোটগল্পে নারীর এই আত্মসচেতন রূপটিই বিশিষ্টতর। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'সহরতলী' উপন্যাসে 'যশোদা' চরিত্রটি তাঁর আত্মসচেতন নারী-কল্পনায় উল্লেখ্য। ছোটগল্পে 'যশোদা'র পথ ধরে এসেছে 'রাবেয়া' (দুঃশাসনীয়), 'বুড়ী' (বুড়ী), 'মঙ্গলা' (মঙ্গলা), 'মালতী' (প্রাণ), 'ময়নার মা' (হারাণের নাতজামাই), 'তমসা' (ধর্ম), 'লতিকা' (মহাকর্কট বটিকা), 'তমাললতা' (লাজুকলতা) প্রভৃতি চরিত্র। বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীকে ভীরু, দুর্বল এবং নিভৃতচারিণী দেখতে চাননি। অবশ্য তাঁর কিছু ছোটগল্পে এ ধারণার ব্যতিক্রম যে ঘটেনি, তা নয়। তবে সে ব্যতিক্রমের মূল কারণ হচ্ছে তাঁর সমকালীণ বাঙলাডদশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ঐ সময়ের সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর নারীর পক্ষে প্রথানুগত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। তাদের মোহ তখন ক্রমশ অপসৃত হচ্ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিল স্বাধিকার ও স্ব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এ কারণেই, তাঁর ছোটগল্পের নারী চরিত্র সমূহ, বলতে হয়, তাদের সমকালের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি।

তথ্যনির্দেশ

১ রায়, প্রদীপ, *বিদ্যাসাগর:সামাজিক ব্যক্তিত্ব,* কলকাতা (১৯৮৬), পৃ. ৬১

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা (১৩৮০), পৃ. ৫২৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

৫ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'সাহিত্য করার আগে', *মানিক গ্রন্থাবলী* ১২শ খণ্ড, গ্রন্থালয়, কলকাতা (১৯৭৫) পৃ. ৫৬০।

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

৮ ভট্টাচার্য, সুতপা, 'নারীমুক্তি আর মানিক বন্দ্যোধ্যায়', *ফ্রয়েড থেকে মার্কস,* কলকাতা (১৩৯৭), পৃ. ৭৪

৯ বসু, ড. নিতাই, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা,* কলকাতা (১৯৭৮), পৃ ২৪৫